গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

- তপন কুমার রায়

'গিরিশ ঘোষ? সে আবার কে? ওঃ নবীন সরকার মহাশয়ের জামাই? সে ত কেরানীগিরি করে। শেক্সপীয়ার আওড়াবে কি করে? কলাপাতার প্রকাণ্ড ঠোঙ্গায় মুড়ে সাজা পান নিয়ে তাকে রোজ আপিসে যেতে দেখি.... শেক্সপীয়ারের সে কি বোঝে?' প্রশ্নটি করেছিলেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট, নাট্যকার ও পরিচালক রসরাজ অমৃতলাল বসু। কালক্রমে সেই 'স্নেহের অনুজশিষ্য' অমৃতলালই 'নাট্য-রবি-কবি বিশ্বে' বলে গিরিশকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই গিরিশ ঘোষই "Father of the Native Stage" নামে পরবর্তী সময়ে পরিচিত হন। যে নাট্য শিল্প অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়েছিল তার মজ্জায় রসসঞ্চার করে, তাকে যিনি আনন্দপূর্ণ করে তুলে ছিলেন তিনি হলেন এই গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

গিরিশের সারা জীবনটাই ছিল বৈচিত্র্যময়। উত্তর কোলকাতার বাগবাজারে ১৮৪৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে নীলকমল ও রাইমনির একাদশ সন্তানের মধ্যে অষ্টম সন্তান গিরিশের জন্ম। বাবা নীলকমল ছিলেন বৈষয়িক ও সওদাগরি আপিসে একজন দক্ষ এ্যাকাউন্টান্ট। মা রাইমনি ছিলেন আর পাঁচজন গৃহিণীর মত ধর্মভীরু ও শান্ত স্বভাবের। দাদা দিদিদের সঙ্গে গিরিশ বড় হয়ে উঠছিল। শিশুকালে স্থানীয় এক পাঠশালায় গিরিশের হাতেখড়ি। মাত্র এগারো বছর বয়সে গিরিশ ওঁর মাকে হারালে মাতৃস্নেহ বঞ্চিত কিশোর গিরিশের মায়ের অভাব অনেকটাই দূর করেন ওর বাবা। অতিরিক্ত আদর দিয়ে হয়তো তার ভবিষ্যতের 'অধোগতি'র পথ সুমসৃণ করেছিলেন তিনিই। কিন্তু পিতৃস্নেহের সঙ্গে যেটুকু বাঁধন ছিল সেটুকুও ঘুচে গেল তার চোদ্দ বছর বয়সে যখন বাবাকেও হারালেন। গিরিশের ভয় করার আর কেউ রইল না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এ-অবস্থায় খুব বেশী দূর এগোয়নি। প্রথম পাঠশালায় পাঠ শেষ করে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে দু'বছর। এর পর হেয়ার স্কুলে পড়তে পড়তে পিতৃবিয়োগ হলে ওখানকার পর্ব শেষ হয়। হালচাল দেখে অভিভাবিকা জ্যেষ্ঠা ভগিনী ওর পনেরো বছর বয়সেই নবীন সরকারের মেয়ে প্রমোদিনীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের পর ১৮৬০ সালে আবার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হলেন কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হল না। ১৮৬১ সালে পাইকপাড়া গভর্নমেন্ট এডেড স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়ে জন্মের মত স্কুলের পাট চুকিয়ে দিলেন। অর্থাৎ গিরিশের জীবনে প্রথাগত কোন শিক্ষালাভ হল না। কলকাতায় সে সময় নব্য যুবকেরা ইংরেজি শিক্ষার স্বাদ পেয়েছে। আর সমাজে ইংরেজি ভাষা না জানা মানুষদের খানিকটা নীচু চোখে দেখা হত। ব্যাপার স্যাপার দেখে গিরিশ তখন বিয়ের যৌতুক পাওয়া গয়না বিক্রি করে ইংরেজি ক্লাসিক সাহিত্যের বই কিনে নিয়ে দিনরাত পড়তে থাকেন। শেক্সপিয়ার থেকে বায়রন আর মাইকেল থেকে বঙ্কিম ও নবীনচন্দ্রের লেখা ওকে কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল। তার সঙ্গে চলতে লাগল হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে চর্চা। ঠিক এই সময়ে গিরিশের দ্বিতীয় সন্তান সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় যিনি পরবর্তী কালে দানীবাবু নামে বিখ্যাত নটশিল্পী হিসেবে পরিচিত। এর পরের তিন বছরে গিরিশের ভবঘুরে জীবন দেখে প্রমোদিনীর বাবা নবীন সরকার গিরিশকে নিজের আপিস Atkinson Tilton Company-তে ১৮৬৪ সালে book keeping-এর কাজে ঢুকিয়ে দেন যাতে ওর সংসার খরচের খানিকটা সুরাহা হয়। এই সময় খেয়ালের বশে কাজের ফাঁকে আপিসে বসে উনি ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। পাড়ায় যাত্রা-থিয়েটার দেখার নেশা গিরিশের ছোটবেলা থেকেই ছিল। সুযোগ আসতেই বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারে ১৮৬৭ সালের দুর্গাপুজোর সময় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাগবাজারের বাড়িতে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাদের ভূমিকায় অভিনয় করে গিরিশ দর্শক মহলে আলোড়ন তুলে দিয়ে স্থানীয় থিয়েটার-প্রেমী মানুষের কাছে অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন। চরিত্রের মুখে বেশ খানিকটা ইংরাজি সংলাপ ছিল। ওর উচ্চারণ-বাচনভঙ্গি এবং অভিনয় দেখে নাটকের রচয়িতা স্বয়ং দীনবন্ধু এক কথায় অভিভূত হয়েছিলেন। ১৮৭১ সালে এই শখের থিয়েটার গোষ্ঠীর নতুন নাম হয় National Theatre যাদের প্রথম নাট্য প্রয়াস ছিল দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী। দর্শক হিসেবে নাট্য রচয়িতা দীনবন্ধু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। গিরিশের জীবনে শুরু হল নতুন এক অধ্যায়। থিয়েটারের শেষে দীনবন্ধু গিরিশকে বলেন তোমার মুখে আমার লেখা কবিতার আবৃত্তি শুনে মনে হল আমার রচনা সার্থক হয়েছে। ইস্কুল ফেল করা গিরিশেকে এই কটা কথা বিরাট ভাবে অনুপ্রেরণা দেয়। আবার এই সময়েই গিরিশ ইয়ারবক্সী নিয়ে নিত্য নতুন আনন্দের গোলক ধাঁধায় ঘুরে বেড়িয়েছেন যখন প্রণয়সুখ বঞ্চিতা নিঃসঙ্গ প্রমোদিনীকে বহু রাত্রি জাগরণের বেদনা সহ্য করতে হয়েছে। ১৮৭২ সালে Atkinson-এর ব্যবসা লাটে ওঠার অবস্থা হলে সাহেব আপিসটি নিলামে তুলে নিজের স্বদেশভূমি আমেরিকায় ফিরে গেলেন। গিরিশ আবার বেকার হলেন আর তার সঙ্গে হারালেন আপিসের দেরাজে থাকা ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদের পাণ্ডুলিপি কারণ যেদিন নিলাম হয়ে আপিসের আসবাব ইত্যাদি বিক্রি হয় সেদিন তিনি স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে কাজে আসতে পারেন নি। চাকরীর সঙ্গে তিনি হারালেন তার বেশ কিছুদিনের পরিশ্রমের ফল। এর কিছুদিন পর গিরিশ Fribarga & Company-তে নতুন চাকরীতে যোগ দেন। ১৮৭৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর গিরিশের জীবনে নেমে আসে নতুন এক বিপর্যয় যেদিন গিরিশের দুই সন্তানের জননী প্রমোদিনী ওকে চিরদিনের জন্য ইহজগত ছেড়ে চলে যান। গিরিশ জীবনে এই প্রথম অবসাদের স্বীকার হলেন। মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিলেন কবিতা ও গান রচনা যার বেশির ভাগই ছিল করুণ রসের। ভগ্নস্বাস্থ্য গিরিশের তখন চতুর্দিকে অশান্তি। মনোবল ভেঙে গেছে, অর্থাভাব প্রবল আর বন্ধুর দল হয়েছে শত্রু। গিরিশ সে সময় ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন এবং হয়ে উঠলেন পুরোপুরি নাস্তিক।

কিন্তু সৃষ্টিশীল মানুষের চিন্তা কখনও থেমে থাকে না। কবিতা রচনা চলতে থাকল। নতুন আপিসের কাজে ওকে প্রায়ই কোলকাতার বাইরে যেতে হত। একবার ভাগলপুরে কাজের জন্য প্রায় পাঁচ মাস থাকতে হলে উনি কলকাতায় ফিরেই ইস্তফা দিয়ে দেন আর ১৮৭৬ সালে India League নামে এক সংস্থায় হেড ক্যাশিয়ার হিসেবে এক বছর কাজ করার পর Parker Company-তে এ্যাকাউন্টান্ট হিসেবে যোগ দেন। ১৮৭৬ সালে গিরিশ দ্বিতীয় বার বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হন বিহারিলাল মিত্রের কন্যা সুরতকুমারীর সঙ্গে। অফিসের কাজের পরে অনেক রাত পর্যন্ত চলতে থাকল নতুন নতুন নাটকের পরিকল্পনা আর মহলা।

তখন নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র আর মাইকেল মধুসুদনের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত তাদের রচনা উপন্যাসের নাটক দেখে। কারণ ক'জনের আর ক্ষমতা ছিল সেগুলো পড়ার মত বিদ্যাশিক্ষা? সাহেবদের তৈরি দু'একটা থিয়েটার এখানে ওখানে হলেও তাতে না ছিল দেশীয় মানুষের প্রবেশাধিকার না ছিল তাদের ঐ ইংরিজি নাটক বোঝবার মত ক্ষমতা। বিনোদনের জন্য সাধারণ মানুষকে খোলা আকাশের তলায় যাত্রাপালা দেখে, আর কবিগান আর পাঁচালি শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। ১৮৭২ সালের ১০ই ডিসেম্বর শরত চন্দ্র ঘোষের প্রতিষ্ঠা করা ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয় দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দিয়ে। এর পরের নাটক হয় ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ সালে মাইকেলের ঐতিহাসিক নাটক কৃষ্ণকুমারী দিয়ে যা ছিল এক রাজপুত রাজকন্যার জীবনী নিয়ে। ১০ই মে ১৮৭৩ সালে রাজা রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারের রাজবাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা অভিনীত হয় স্বয়ং বঙ্কিমের উপস্থিতিতে। ন্যাশনাল থিয়েটারে এই সময় শরত ঘোষ মশায় নাটক নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি তৈরি করেন যাতে বঙ্কিম, মাইকেল, বিদ্যাসাগরের মত মানুষেরা ছিলেন। বিধবা বিবাহ, নব-নাটক ইত্যাদি কয়েকটি মঞ্চ সফল নাটকের পরে এঁরা মনে করেন যে এতে বিনোদনের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা লাভ হলে সমাজ উপকৃত হবে। এই সময় মাইকেল তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটকটি কমিটিতে দিলে গিরিশ এক কথায় এটি মঞ্চস্থ করতে চান। মাইকেল কিন্তু মহাভারতের প্রেম কাহিনী নিয়ে রচনা করা নাটকটিতে পুরুষদের নারী চরিত্রে অভিনয় করাতে আপত্তি জানান। কিন্তু সে কালে 'ভদ্র'-বাড়ীর মেয়েদের নাটকে অংশগ্রহণ করাকে অসামাজিক মনে করা হত। অগত্যা গিরিশ কয়েকজন বারাঙ্গনাকে শিখিয়ে পড়িয়ে অভিনয় জগতে নিয়ে আসায় প্রতিবাদ-স্বরূপ বিদ্যাসাগর মশায় এই কমিটি থেকে ইস্তফা দেন। মাইকেলও সে সময় খুবই অসুস্থ হলে

পাঁচ'শ টাকার বিনিময়ে নাটকের স্বত্ব শরত ঘোষ মশায়কে বিক্রি করে দেন এবং তাঁর কয়েক দিন পরে ২৯শে জুন, ১৮৭৩ সালে মাইকেলের জীবনাবসান হয়। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৬ই অগাস্ট ১৮৭৩ সালে। ন্যাশনাল থিয়েটারের পরের নাটকটি ছিল বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী যেটি সেই বছরের ২০শে ডিসেম্বর প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এর পর বছর পাঁচেক গিরিশচন্দ্র বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করেন যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য। সাধারণ দর্শকের বোঝার সুবিধার জন্য মাইকেলের এই মহাকাব্যের চতুর্দশপদী অমিত্রাক্ষর ভেঙে নতুন এক খোলা ছন্দে গিরিশ এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যা পরবর্তী সময়ে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হয়। এই নাটকে গিরিশ নিজে দ্বৈত ভুমিকায় অভিনয় করেন- রাম এবং মেঘনাদ। মধুসূদন ছিলেন গিরিশচন্দ্রের প্রিয় কবি। মধুসূদনের এই কাব্যটি ওঁর জাতীয়তাবাদের মূল প্রশ্নে এক বিস্ময়। তিনি খ্রিস্টান, চালচলনে পুরোদস্তুর ইংরেজ, ইংরেজের চেয়ে বেশী ইংরেজ অথচ ভারতের পুরাণে নিমগ্ন। তাঁর রচনার বিষয় রাম-রাবণ-মেঘনাদ-রাধাকৃষ্ণ-জনা। ভারতের পুরাণকে কি ভাবে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে মধুসুদনের কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন গিরিশ। গিরিশ মাইকেলের রচনার মধ্যে কাব্যরস ছাড়াও পেয়েছিলেন জাতীয়তাবাদ এবং সমাজ সংস্কারের ভাবনা। 'একেই কি বলে সভ্যতা' বেলগাছিয়ায় অভিনীত হতে পারেনি 'বাবু'-দের সমবেত প্রতিরোধে। কিন্তু এই নাটকের বক্তব্য দাবানলের মত লোকগীতির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

গিরিশের পক্ষে আপিসের কাজ আর নাটক একসঙ্গে চালানো এর পরে কঠিন হয়ে দাঁড়ালে ১৮৭৯ সালে পার্কার কোম্পানি থেকে পার্কার সাহেবের একান্ত অনুরোধ ও আপত্তি উপেক্ষা করে ইস্তফা দিয়ে পুরো সময়ের জন্য নাট্য জগতের সঙ্গে যুক্ত হলেন। ১৮৮০ সালে যখন গিরিশের বয়স মাত্র ৩৬ তখন থেকে গিরিশের জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায় – ম্যানেজার, নাট্যকার, পরিচালনা ও অভিনেতা হিসেবে দ্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। নতুন মালিক প্রতাপ চাঁদ জহুরী ওঁকে ম্যানেজার হিসেবে মাসিক এক'শ টাকার বেতনের চাকরীতে বহাল করেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে এর আগে পর্যন্ত নাট্য জগতে নবীনচন্দ্র, মাইকেল ও বঙ্কিমের মূল রচনার নাট্যরূপই ছিল নাটকের প্রধান বিষয়।

গিরিশের নাট্য রচনা, অভিনয় বা পরিচালনার আলোচনা করতে গেলে সে সময়ের বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানা দরকার। কোম্পানির রাজত্বের শেষ ভাগে সারা ভারতে এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয় সিপাহি বিদ্রোহের সময়। বিদ্রোহ দমন করার পরে রানীর শাসন কায়েম হলে ইংরেজি-জানা ও ইংরাজ-ভক্ত শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজ ১৮৫৭ সালের এই গৌরবময় বিদ্রোহের মত স্মৃতিকে এক কথায় ধর্মীয় উন্মাদনা বলে উপহাস করতেন। এই বিশৃঙ্খল সময়ে একজন 'অশিক্ষিত' মানুষ 'ভদ্রলোকদের' ভাষায় 'মূর্খ', যার ভাষা 'অশ্লীল', গ্রাম্য তীব্র কথায় বোঝায়- ঠিক যেমন কবিয়াল ও যাত্রাওয়ালারা- এই মানুষটি বিনয়ের হাসি মুখে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সমাজের মুখোমুখি। ইংরেজ-ভক্তরা যখন কারণে অকারণে হিন্দু শাস্ত্রের শ্রাদ্ধ করছেন প্রকাশ্যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন তাঁর হিংস্রতম স্তরে পৌঁছেছে, খৃস্টধর্ম যখন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে তখন রামকৃষ্ণ পরমহংসের উদয়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক এই পরিস্থিতিতে গিরিশের কথায় ফিরতে হলে প্রথমেই আসে ওঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে দু'একটি কথা। দৈনন্দিন জীবনে উনি কিন্তু কখনই প্রথাগত সামাজিক কোন নিয়ম কানুনের ধার ধারেন নি। নাট্য জগতে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করার মধ্যে চলতে থাকল অপরিমিত মদ্যপান ও চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল যাপন। এইরকম টালমাটালের সময় ১৮৮৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর গিরিশের জীবনে ঘটে গেল বিরাট এক পরিবর্তনের ঘটনা। তখন গিরিশের প্রযোজনায় স্টার থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে ওঁর নিজের রচনা চৈতন্যলীলা যাতে চৈতন্যের ভুমিকায় অভিনয় করছেন বিনোদিনী। লক্ষণীয় যে সে সময়কার রক্ষণশীল সমাজে উলটপুরাণ হিসাবে পুরুষ চরিত্রে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করান ছিল গিরিশের এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। এই নাটকে ওনার নিজের কোন চরিত্র ছিল না। নাটকটি সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং লোকমুখে তার প্রচার হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের ভক্ত-শিষ্যরা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে সেদিন সন্ধ্যায় নাটকটি দেখাতে নিয়ে আসার প্রস্তাব করলে গিরিশ ঠাকুরের জন্য বক্সে একটা আসন বিনামূল্যে দিতে রাজী হলেও অন্যান্য সঙ্গিসাথীদের থেকে প্রবেশ মুল্য নিয়ে ছিলেন। ঠাকুরকে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করে ওঁদের সবার জন্য বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে সন্ধ্যের মুখে গিরিশ কিন্তু থিয়েটার ছেড়ে বাড়ি চলে যান। নাটকটি দেখে রামকৃষ্ণদেব এক কথায় অভিভূত হয়ে ছিলেন যা আমরা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লেখার মধ্যে পাই। চৈতন্যলীলার সেদিনের 'শো' গিরিশের জীবনে আর তার সঙ্গে বাংলা তথা কোলকাতার নাটকের জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব চৈতন্যের অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে মন্তব্য করে ছিলেন 'এঁরা আসল নকল সব একাকার করে দিল'। কথাকটি লোকমুখে গিরিশ পরে শুনতে পান। এর পরে বিভিন্ন সময়ে রাসমণির বাগান দক্ষিণেশ্বর থেকে বিভিন্ন জায়গায় গিরিশের ঠাকুরের সঙ্গলাভ করার সুযোগ হয় আর এই সময়টাই গিরিশের জীবনে দ্বিতীয় 'পানিপথ' হিসেবে উপস্থিত হয়। প্রথম দর্শনে গিরিশ ঠাকুরের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন একজন পাপী হিসেবে। ঠাকুর ওঁর এই 'পাপ' ঘোচাবার জন্য ৺মা-ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করতে বলেন এবং গিরিশ তাতে সময়াভাবের অজুহাত দিয়ে প্রার্থনা করতে রাজী না হলে গিরিশের কাছে ঠাকুর 'বকলমা' নিয়ে নেন ওঁর হয়ে পাপ মকুবের জন্যে আর্জি জানাবার। ঠাকুরের কাছে এই দায়ভার দিয়ে গিরিশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন আর তার সঙ্গে ক্রমশ তাঁর হারিয়ে যাওয়া ধর্ম-বিশ্বাস নতুন এক ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে আসতে শুরু করে। উপরি হিসেবে ঠাকুরের কাছে পেলেন 'পাপ' এবং 'পাপী'র সম্বন্ধে নতুন এক ব্যাখ্যা। ঠাকুর তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে সব সাধু-সন্তের যেমন অতীত আছে তেমনি সব পাপীরও ভবিষ্যৎ আছে। বেদান্তবাদের ব্যাখ্যাও যেন নতুন করে পেলেন এক গ্রাম্য মানুষের থেকে একান্ত গ্রাম্য ও চলিত ভাষায়। ওঁর দৈনন্দিন জীবনেও এল এক অদ্ভুত পরিবর্তন। উনি তখন সংসার ও কর্মজীবনের বদলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাস জীবন চাইলে ঠাকুর আদেশ করলেন কর্মের মধ্যে থেকে সাধারণ নিরক্ষর মানুষের জন্য 'থ্যাটার থেকে লোকশিক্ষে' দিয়ে যাবার জন্য। গিরিশ এক কথায় আদেশ শিরোধার্য করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরুর আদেশ পালন করে গেলেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল ১৮৮৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে ঠাকুরের প্রয়াণ ১৬ই অগাস্ট ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত সময়টা কিন্তু খুব বেশী নয়। প্রথম দর্শনের অল্প সময় পরেই ঠাকুরের গল-রোগ হবার পর গিরিশ শ্যামপুকুরের বাড়ি থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠাকুরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে ছিলেন। গিরিশের জীবনে এল এক নতুন অধ্যায়। মদ এবং বিলাস বিহীন নতুন এই সরল জীবনযাত্রার সম্বন্ধে লোকে জিগ্যেস করতে থাকলে উনি বলতেন 'পাপ রাখার এত বড় একটা জায়গা আছে আগে জানলে চুটিয়ে আরও একটু পাপ করে নিতাম'। ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই গিরিশের চেয়ে বয়সে অনেক কম হলেও ওঁদের মধ্যে গিরিশের প্রতি একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত সম্পর্ক বরাবরই ছিল। বেলুড় মঠ থেকে এঁরা অনেকবার স্টার ও অন্যান্য মঞ্চে গিরিশের নাটক দেখতে এসেছেন। মার্গারেট নোবল ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচয় পাবার আগে ১৮৯৮ সালে স্টার থিয়েটারেই স্বামীজী ওঁকে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। স্বামীজীর ও অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে গিরিশের কথোপকথন এবং পত্রালাপ আজ ইতিহাসের দলিল।

গিরিশের অভিনয় জীবন শুরু হয় ১৮৬৭ সালে যখন ওঁর বয়স ছিল তেইশ। আর নাট্যকার হিসেবে রচনা শুরু করেন তেত্রিশ বছর বয়সে ১৮৭৭ সালে। এই দ্বৈত ভূমিকা উনি নিষ্ঠার সঙ্গে আমৃত্যু পালন করেন ১৯১২ সাল পর্যন্ত। ওনার নিজের রচনা মোট আশিটি নাটক যার মধ্যে আটটি অসমাপ্ত। অন্যের রচনার নাট্যরূপ দেন প্রায় এক ডজন যার মধ্যে বঙ্কিমেরই সাতটি। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক, স্বাদেশিকতা ও হাস্যরসের বিষয়বস্তুই ছিল গিরিশের নাট্য রচনার প্রধান বিষয়। এ ছাড়া অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ছোটগল্প ২৫টি, কাব্য ১টি, জীবনী ১টি, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আর হিন্দু ধর্মের ওপর প্রবন্ধ ১৮টি, নাটক সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ১৪টি, সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর প্রবন্ধ ২টি, গান ১৩৭০টি, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ২টি। গিরিশের মৌলিক রচনা অন্য ভাষায় অনূদিত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বুদ্ধদেব-চরিত ইংরাজিতে (যা লন্ডনের Court Theater-এ অভিনীত হয়), নল-দময়ন্তী ফরাসী ভাষায়, বিল্বমঙ্গল ইংরাজিতে (ভগিনী নিবেদিতা সম্পাদিত) ও চিত্ত-চমকপ্রদ নাটক 'বিপদ' হিন্দিতে 'দুখিয়া' নামে, যা এলাহাবাদে বহু রজনী অভিনীত হয়। গিরিশের সম্পূর্ণ রচনা পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত মোট ৩৭১৭ পৃষ্ঠায়।

গিরিশের নিজের হাতে তৈরি নটশিল্পীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধ ঘোষ এবং নিজের সন্তান সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যিনি দানীবাবু নামে নাট্যজগতে বিখ্যাত। নটিদের অনেকের মধ্যে বিনোদিনী, তারাসুন্দরী ও তিনকড়ি বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁদের অভিনয় সম্বন্ধে বহু বিদগ্ধ নাট্য ব্যক্তিত্বের অনেক লেখা আছে।

গিরিশের দুর্ভাগ্য হল তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ গিরিশকে খণ্ড খণ্ড করে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিচার ও মন্তব্য করেছে। যেমন 'এইখানে রামকৃষ্ণের প্রভাব', 'এইটে বিবেকানন্দের কাছে শেখা', 'এইটে তখনকার দর্শকদের খুশী করার প্যাঁচ' ইত্যাদি। তারা কেউই গিরিশের সৃজনী

প্রতিভার পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেনি। অবশ্যই গিরিশ রামকৃষ্ণের শিষ্য, বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ গুরু-ভ্রাতা। কিন্তু তাঁর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- কোন সমাজে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গিরিশচন্দ্রের জন্ম, পুষ্টি, বিকাশ ও কর্মকাণ্ড, সমাজ বিবর্তনের কোন সন্ধিক্ষণে তাঁদের আবির্ভাব এবং সে বিবর্তনে তাঁদের ভূমিকা কি- তার বিচার করা। গিরিশ বাবুরা নাট্যশিল্পকে বড়লোকের জলসাঘর থেকে বের করে এনে অত্যন্ত সফল ভাবে সাধারণ মানুষের অর্থের ওপর দাঁড় করালেন। বহু দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ একত্রে বসে যেমন নাটক দেখতেন তেমনি তাদের চাহিদার প্রতিফলনও নাটকে ঘটাতেন। কারণ গিরিশ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন বাস্তব জীবন থেকেই নাটকের সৃষ্টি। এইখানেই গিরিশের সঙ্গে সমসাময়িক তথাকথিত 'শিক্ষিত বাঙ্গালীর' একটা তফাত গড়ে উঠল। তাদের বিচারে গিরিশ হল পাঠশালায় শিক্ষিত ইস্কুল ফেল করা ছেলে। তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পাঠশালায় আর বাকিটা ঘরে বসে। ইংরেজের চাকুরি যাদের কাছে ছিল স্বর্গলাভের সুখ তাদের সঙ্গে গোড়াতেই গিরিশের ছাড়াছাড়ি। উপরন্তু তিনি 'সেকেলে', 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন', আর ছিলেন 'নেটিভ' কবি ঈশ্বর গুপ্তের গুণমুগ্ধ আর দিগম্বর কথকের প্রায়-শিষ্য, নিজে হাফ আখড়াইতে গান বাঁধতেন। সুতরাং গিরিশ প্রথম থেকেই নিজশ্রেনী থেকে বিচ্ছিন্ন। গিরিশের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে তাঁর 'ছোটলোক' দর্শকদের নিয়ে, বারাঙ্গনা-অভিনেত্রীদের ঘিরে, তাঁর সমাজচ্যুত অভিনেতাদের নিয়ে। তিনি থিয়েটারওয়ালা শুধু নন, মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনে তিনি ছিলেন 'মাতাল' যাত্রাওয়ালা। তথাকথিত 'ভদ্র'-সমাজ থেকে গিরিশরা পেয়েছিলেন শুধু ধিক্কার, উপহাস আর কাপুরুষোচিত টিটকিরি আর কুরুচিপূর্ণ ব্যঙ্গ। ফলেই না দীর্ঘশ্বাসের মত গিরিশের উক্তি "অভিনেতার শবদেহের সংস্কার-স্থান পাওয়া কষ্টকর হয়"। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নীলদর্পণের অভিনয় করার পর সরকারী নির্দেশে নাটকের অভিনয় বন্ধ করতে হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সেই উত্তাল সময়ে গিরিশের সিরাজুদ্দৌলা নাটকটি জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগালে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী আইন প্রয়োগ করে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পরে বিপ্লবী বিপিন চন্দ্র পাল বলেছিলেন কোলকাতার নাটক জনমানসে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জাগাতে প্রভূত সাহায্য করেছে।ভারতে আবহমানকাল ধরে জ্ঞান মার্গের সু-উচ্চ শিখরে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের বিমূর্ত চিন্তায় সাধারণ মানুষ কোনোদিনই উঠতে পারেনি। নীচেকার অসংখ্য মানুষের জন্য ভক্তিমার্গ, সাকার দেবতা, প্রতিমাই হল ধর্মের রূপ। কোলকাতার 'ভদ্র' সমাজের শাসনে এই গান-যাত্রার ক্ষেত্রে অন্তত এই বাধা ভাঙল। যাত্রা ও শখের থিয়েটার সৃষ্টি করল বড় এক দর্শক গোষ্ঠী। তারই ফলে সম্ভব হল গণ-নির্ভর পেশাদার নাট্যশালার সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্র এই গণ ঐতিহ্যের ফল, নাট্যশালায় কবিগান-পাঁচালীর প্রতিনিধি।

১৯১২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি এক বর্ষণমুখর রাতে ১টা বেজে কুড়ি মিনিটে (বাংলা মতে ৮ই ফেব্রুয়ারি) কোলকাতায় নিজের বাড়িতে গিরিশ চন্দ্র ঘোষের অন্তিমশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে বিলীন হল গুণমুগ্ধ ভক্ত, বন্ধু, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে অসংখ্য নাট্যকর্মীর উপস্থিতিতে। পরের দিন সকাল হলে কোলকাতার বিখ্যাত গুণীজনের উপস্থিতিতে প্রায় সহস্র মানুষের উপস্থিতিতে কাশী মিত্রের ঘাটে রামকৃষ্ণ-হরিবোল ধ্বনিতে চন্দনকাঠ, ধুনা ও কর্পূরে বাগদেবির বরপুত্রের দেহ ভস্মে পরিণত হল।

গিরিশের জীবনী ও নাট্যশিল্পের উপর ওঁকে নিয়ে বহু মানুষ লিখেছেন ও মন্তব্য করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে হলে প্রথমেই বলতে হয় কথামৃত-কার শ্রী 'ম'-এর নাম। এর পরেই আসে অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কুমুদবন্ধু সেন, ভগিনী নিবেদিতা, সারদানন্দ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দ, দিলীপ কুমার রায়, শ্রীশ চন্দ্র মতিলাল, ক্রিস্টোফার ঈশারউড, কিরণ চন্দ্র দত্ত, বিনোদিনী দাসী, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেশ সমাজপতি, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অহীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাসবিহারী সরকার, শিশির কুমার ভাদুড়ী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাট্য জগতের সঙ্গে যুক্ত আরও অনেক গুণী মানুষ।

বড় পর্দায় মহাকবি গিরিশ্চন্দ্র চলচ্চিত্রে নাম ভুমিকায় পাহাড়ি সান্যালের সফল অভিনয়ের পর বিশ্বরুপার কর্ণধার রাসবিহারী সরকারের অনুরোধে উনি এটির নাট্যরূপে বেশ কিছুদিন অভিনয় করে ছিলেন। আধুনিক থিয়েটারের যুগে নান্দীকার গোষ্ঠীর প্রযোজনায় ১৯৭২ সালে ৫ই ডিসেম্বর থিয়েটার রোডের কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে 'নটী বিনোদিনী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। বিংশ-শতাব্দী পত্রিকার ১৯৬৫ শালের শারদীয়া সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন ঘোষের লেখা ঐ অভিনেত্রীর জীবনী নির্ভর একটি গল্প থেকে এটির নাট্যরূপ দেন 'শের আফগান', তিন পয়সার পালা' বা 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' খ্যাত নাট্যগোষ্ঠী। উৎপল দত্ত সত্তরের দশকে মিনার্ভা থিয়েটারে 'কল্লোল' ও 'অঙ্গার' প্রযোজনার পর বোম্বে শহরে একটা কাজে থাকা কালীন গ্রেফতার হয়ে আর্থার জেলে ও তারপরে কোলকাতায় দমদম সেন্ট্রাল জেলে কিছুদিন কারাবাসের পর মুক্তি পেলে প্রথম প্রযোজনা করেন 'টিনের তলোয়ার' যা ছিল ওঁর গিরীশ ঘোষের প্রতি এক শ্রদ্ধার্ঘ। ওঁর সমসাময়িক অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে গিরিশ ঘোষের নাট্য শিল্প নিয়ে চর্চা করে নটগুরুকে আবিষ্কার করেন ও গিরিশের নাট্য জীবন নিয়ে 'গিরিশ মানস' নামে একটা সম্পূর্ণ বই লেখেন যা উনি ওনার নাট্য জীবনের সহকর্মী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। ■

গ্রন্থঋণঃ

১) Girish Chandra Ghosh- A Bohemian Devotee of Sri Ramkrishna By Swami Chetananda

২) শ্রী রামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ- নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

৩) গিরিশ মানস – উৎপল দত্ত

৪) Towards A Revolutionary Theatre By Utpal Dutta

তথ্যঋণঃ

সাংবাদিক তরুণ কুমার গোস্বামী, নাট্য বিশারদ বিপ্লব দাশগুপ্ত ও স্নেহের পুত্র কৌস্তভ রায়

ক্ষুদ্‌দা ও তেলের ব্যবহার

- অনুপম গুপ্ত

ক্ষুদিরাম চাকলাদার রমলা বৌদিকে নিয়ে পঞ্চমবার জাপানে গেলেন পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতনী ফুচা বা খুকুর টানে। দাদা বৌদি নাতনী খুকুকে খুবই ভালবাসেন। ভালবাসারই তো কথা। বিদেশে থাকার জন্য নাতনী বাংলা কবিতা খুব একটা জানে না। বৌদি কোনো এক ছুটির দিন সকালে নাতনীকে অন্নদাশংকর রায়ের "তেলের শিশি ভাঙ্গলো বলে খুকুর পরে রাগ কর" কবিতটি শেখাচ্ছেন। খুকু যখন একটা ব্রেক নেওয়ার জন্য অন্য ঘরে গেল, তখন ক্ষুদ্‌দা বৌদিকে জিজ্ঞেস করলেন যদি কোনো শিশু-দরদী ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করে খুকুর নাগালে শিশিটা এলো কি করে? খুকু নিশ্চয়ই উঁচু তাক থেকে তার নাগালের বাইরে থেকে তেলের শিশি নামিয়ে আনেনি। জাপানে রান্নার সরঞ্জাম, নানা রকম মশলা, তেলের শিশি উঁচু তাকেই থাকে। খুকুর মা-ই হয়তো তেলের শিশি নামিয়ে রেখেছে খুকুর বাবাকে দেবে। বাবা হয়তো তার বস্‌কে তেল দেবে যাতে পরের প্রমোশনটা বাবাকেই দেওয়া হয়। শিশিটা যে খুকুর কাকা নামিয়ে রাখেনি এটাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না, কারণ কাকাকে নাকি দেশে ফেরৎ পাঠানোর কথা হচ্ছে। জাপানের মত উন্নত দেশ ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর বা সল্টলেকের সেকটর ফাইভে ট্রান্সফারের কোনো মানে হয়? বস্‌কে তেল দিয়ে এই ট্রান্সফারটা আটকাতেই হবে।

বৌদি বললেন, তার মানে গোপনে তেল অনেকেই দেয়। বেচারা খুকু অত কিছু না জেনে তেলের শিশিটা ভেঙ্গে ফেললো বলে তোমরা সবাই ধরা পড়ে গেলে। দাদা বললেন, তা যতই বলো, তোমার নিজের ছোট পিসেমশাই সরকারি অফিসের অত বড় একজন জাঁদরেল অফিসার, যাঁর আয়ের সঙ্গে গচ্ছিত সম্পত্তির মিল কিছুতেই করা যাচ্ছিল না বলে উঁচু মহলে কত তেল খরচ করতে হয়েছিল মনে আছে? বৌদির সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো উত্তর, আহা হা, তোমার নিজের ছোট ভাই প্রফুল্ল চাকলাদার, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উঁচু পদের অফিসার। মুম্বাইয়ের পানশালার এক বার-ড্যান্সারের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে নিজের নাম জড়িয়ে যাওয়ার জন্য লোক জানাজানি হওয়ার হাত থেকে এবং গৃহশান্তি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় কত লিটার তেল খরচ করেছিল ভুলে গেছ কি?

ব্রেকের পরে নাতনী ঠাকুমার কাছে চলে এসেছে। এসে দেখছে তার তেলের শিশির কবিতা নিয়ে ঝগড়া চলছে। তবে ঝগড়ার বিষয়বস্তু সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তেলের শিশিটা অ্যাক্সিডেন্টালি ভেঙ্গে গেছে, তাই নিয়ে এত কথা বলার কি থাকতে পারে?

ক্ষুদ্‌দা রমলা বৌদিকে বোঝাচ্ছেন, তেল দেওয়ার রীতি আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে। এই দেখো না, ভূতের রাজা গ্রাম বাংলার ক্যাবলা ভবঘুরে দুটো ছেলেকে কি রকম তেল দিল!

বৌদি বললেন, তুমি এর মধ্যে তেল দেওয়ার কি দেখলে? দাদা বললেন, বাঘের ভয়ে ভীত দাঁতকপাটি লাগা দুটো ছেলেকে ভূতের রাজা তিন তিনটে বর দিলেন কেন? কারণ নিরীহ দুটো ছেলে ভূতের রাজার মাহাত্ম্য দেশ বিদেশে প্রচার করবে এবং "দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন" আপ্ত বাক্যটি কাজে লাগাবে। শুম্ভির রাজা এবং হাল্লার রাজা দুজনেই এর প্রমাণ পেয়েছেন। হীরক রাজাও এমন প্রমাণ পেলেন যে জনগণের স্লোগানে রাজা নিজেই গলা মেলালেন "দড়ি ধরে মার টান, রাজা হবে খান খান"। এখানেও পাঁচ বছর অন্তর দড়ি ধরে টান মারা হচ্ছে, কিন্তু রাজা খান খান হচ্ছে, নাকি দড়িটাই ছিঁড়ে যাচ্ছে সেটা নির্ভর করছে মিডিয়া, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনে কতটা তেল দেওয়া হয়েছে তার ওপর।

ক্ষুদ্‌দা রমলা বৌদিকে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী সিনেমা করার সময় তাঁর আর্থিক সংকটের কথা মনে করিয়ে দিলেন। সত্যজিৎ রায় পশ্চিম বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মিঃ মাথুরের কাছে তাঁকে যেতে হল এবং চলচ্চিত্রের সারাংশটা বোঝাতে হল। ওনাদের আপত্তি হরিহর গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাবে কেন? আর তা ছাড়া গ্রামের অত কাশফুল দেখিয়ে লাভ কি? কাশফুল দিয়ে কি গ্রামের ব্যবসা বাণিজ্য ভাল হবে? এগুলো পাল্টাতে হবে। সত্যজিৎ রায় অতিকষ্টে হাসি চেপে বললেন, এগুলো পাল্টালে সদ্যপ্রয়াত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী আপত্তি করবেন। রমলা বৌদি মনে করিয়ে দিলেন বিজয়া রায়ের লেখা "আমাদের কথা" বইটাতে তিনি পড়েছেন। ক্ষুদ্‌দা বললেন এটা বোধহয় রিফাইনড অয়েল। দাদা বললেন, এই ধর তুমি রাগ করে আহিরীটোলায় বাপের বাড়ীতে চলে যাও এবং প্যাসিভ ভয়েসে বল যে এক মাসের আগে আর আসছ না। কিন্তু দু এক দিন পরেই আলমারীর চাবিগুলো ঠিকমত রাখা হয়েছে কি না এই অজুহাতে চলে আস না? বৌদির ঝাঁঝালো উত্তর, সে তো তুমি পরের দিনই বাবা মাকে তেল দিয়ে আস, তাই তো চলে আসি।

মোদ্দা কথা তেল সবাইকে দিতে হয়। ছোট রাজ্য বড় রাজ্যকে তেল দেয়। গোয়ালিয়রের রাজা, পাতিয়ালার রাজা, কুচবিহারের রাজা স্বাধীন হলেও বৃটিশ রাজশক্তিকে তেল দিয়েছে। বালী এবং সুগ্রীব রামকে তেল দিয়েছে। সুগ্রীব রামকে ঠিক তেলই বরাবর দিয়ে যাচ্ছে। বালী একবার রামকে ভুল করে অন্য তেল দিয়ে ফেলেছে, ফলে বালীকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হল। আরে বাবা মেশিন অয়েল দিয়ে কি আর মাছ ভাজা যায়? সব তেল নিশ্চয়ই এক নয়।

সীতাকে রাবণ কিডন্যাপ করে নিজের দেশে নিয়ে গেছে। সুন্দরী স্ত্রী সীতার জন্য ডার্ক কমপ্লেকশানের রাম চিন্তিত। লংকা রাজ্যের কোনো খবর ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে না। সীতা কেমন আছে, কি করছে, কতটা কাঁদছে, রামের জন্য আদৌ কাঁদছে কিনা, কিংবা লংকার অন্যান্য সুদর্শন বীর্যবান রাজপুরুষদের দিকে নজর চলে যাচ্ছে, কি খাচ্ছে, সঙ্গে তো টাকাপয়সা নেই যে কিনে খাবে। যদিও বনবাসে টাকা থাকার কথাও নয়, তবে সীতা বিপদ আপদের জন্য কিছু টাকা লুকিয়ে রাখলেও রাখতে পারে (যেমন রমলা বৌদি কিছু টাকা লুকিয়ে রাখেন)। কিন্তু মুশ্‌কিল হচ্ছে অযোধ্যার কারেন্সি নোট তো লংকায় অচল। সোনার গয়নাও রামকে পথ বোঝানোর জন্য জঙ্গলে ফেলতে ফেলতে গেছে। যদিও সীতার বনবাসে গায়ে অত গয়না থাকার কথা নয়। যাইহোক, সীতার কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো সিক্রেট এজেন্সি, স্পাই, প্রাইভেট গোয়েন্দা, ব্যোমকেশ, ফেলুদার মত কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বিভীষণকে তেল দিয়েই রামের কার্য সিদ্ধি হল। তবে এর জন্য বিভীষণের চরিত্রে চিরদিনের মত একটা কলঙ্ক থেকে গেল। ঘরের শত্রু ---নাঃ থাক, রামভক্ত হনুমানের সংখ্যা কম নয়। তার মানে তেলের বিনিময়ে কলঙ্ক? ক্ষতি কি?

ফুচা বা খুকু অনেকক্ষণ ধরে ওদের কথা শুনছিল। বোঝার চেষ্টাও করছিল। সবাই চেনা চরিত্র। কিন্তু আলোচ্য বিষয়বস্তু মাথায় ঢুকছে না। তেলের শিশিটা হয়তো হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। এর মধ্যে তার বাবা, কাকা, বালী, সুগ্রীব, রাম, সীতা, বিভীষণদের টেনে আনার কোনো মানে হয়? ওর মাথায় ট্যানজেন্ট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ভেতরে ঢুকছে না। ঢোকার কথাও নয়। সীতার তো রামের জন্য কাঁদাই উচিত। রামেরও উচিত কাঁদা।

রমলা বৌদি দাদাকে বললেন, "হ্যাঁ গো আমাকে কেউ যদি কিডন্যাপ করে তুমি আমার জন্য কাঁদবে"? দাদা বললেন, সে কি! আমি তো হাউ হাউ করে কাঁদবো। আর মনে মনে গেয়ে উঠলেন "এমন দিন কি হবে মা তারা"?

তেলের ব্যবহারের কথা জানা গেল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনযো আবে ভোটারদের কি রকম তেল দেন সেটা অবশ্য জানা গেল না। আমাদের দেশে তেলের ব্যবহার ওয়ান ইজ টু ফাইভ, মানে ভোটপ্রার্থী একবার ভোটারদের তেল দেবেন, আর জিতলে ভোটাররা পাঁচ বছর ধরে ওনাকে তেল দিয়ে যাবেন। যাই হোক, তেল ব্যবহারের কথা নানাভাবে বলা হল, সেটা সঠিক কি বেঠিক পাঠকদের বিচার্য।

অন্নদাশংকরের "তেলের শিশি" কবিতাটা খুকু বা ফুচার আর মুখস্ত করা হল না। ও দেখলো যে ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার মধ্যে যতই ঝগড়া হোক না কেন, ওরা দুজনেই খুব হাসছে। এ কেমন ঝগড়া?

তবে ফুচা আজকাল খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমোতে যায় এবং সকালে ঘুম ভাঙলে দৌড়ে রান্নার জায়গায় গিয়ে কিছু একটা দেখে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে যায়। ক্ষুদ্‌দা বললেন, হয়তো তেলের শিশিটা ঠিক আছে কি না দেখে নেয়।। ■

সংগ্রামী মা

- গৌতম সরকার

ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু শুভাশিস আমার মাকে স্মরণ করায়, ওকেই লেখা চিঠি -

সেই কোন ছোটবেলার কথা, মানুষটাকে ভুলে যাওয়ারই কথা! তবুও তুই মনে রেখেছিস। এটা জেনে বিস্মিতও হলাম, আবার তোর স্মৃতি-শক্তির ওপর আমার শ্রদ্ধাও বাড়ল।

আমাদের বেড়ে ওঠার সময়তো আর 'মাদারস ডে' বলে কিছু ছিল না, পরে বড় হয়ে বিদেশে এসে এটা শিখি। এখন দেখছি ভারতেও এটা হয়! তবে তুই, আমি যখন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের ক্লাস ওয়ানে পড়ি, তখনকার একদিনের কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। তখন তো মাদারস ডে থাকার কথা নয়, তবে কোন বিশেষ দিন ছিল নিশ্চয়। কারণ সেদিন আমাদের ক্লাস-টিচার ইন্দিরা-দি ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর কেন জানি না লিখেছিলেন -

মাকে আমার পড়ে না মনে
শুধু যখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুন গুনিয়ে কানে আমার বাজে
মায়ের কথা মিলায় তখন আমার খেলার মাঝে।

লেখার পর ইন্দিরা-দি যখন ব্ল্যাকবোর্ড থেকে আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন, আমার পরিষ্কার মনে পড়ে, দেখি উনি অঝোরে কাঁদছেন! কে যেন একজন জিগ্যেস করেছিলো যে ওনার চোখে জল কেন? তখন উনি বলেছিলেন - "বড় হোলে বুঝবে, এখন নয়"।

সেই দিন আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি যে ঐ ঠাকুমা-দিদিমার বয়সী ইন্দিরা-দি কেন কেঁদে ছিলেন। যখন বুঝলাম, তখনো কিন্তু আমি ছোটোই! শুধু মনে হয়েছিলো এই যে, ইন্দিরা-দি ভুল বলেছিলেন, তা না হোলে আমার বড় হওয়া পর্যন্ত তো অন্তত মায়ের বেঁচে থাকার কথা!

খুব ছোটবেলায় মাকে মিস করতাম; জুতোর ফিতে বেঁধে দেওয়ার জন্য, জামার বোতাম সেলাই করার জন্য, স্নান করার সময় মাথায় জল ঢালার জন্য, নারকোল-নাড়ু, নিমকি বা রসবড়া খাওয়ার জন্য, শীতকালে হাতে বোনা সোয়েটার পড়ার জন্য, এইসব। তারপর মানুষটাকে আমি প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিলাম, যদিও বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন তত

দিন আমাদের তিন ভাইকে কিছুতেই মানুষটাকে পুরোপুরি ভুলে যেতে দেননি। বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বেড়োনোর দিন, বা ভালো কিছু করার পর বাবাকে প্রনাম করতে গেলেই বাবা পা সরিয়ে নিতেন; দেওয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিটা দেখিয়ে বলতেন "উঁহু, আগে মা-কে"! এছাড়া মায়ের আর তেমন কোন অস্তিত্বই থাকলো না তখন আমার জীবনে। আর থাকবেই বা কি কোরে? বন্ধু-বান্ধব, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ফুটবল, সিনেমা, পড়াশোনা - এইসবের মাঝে মায়ের আর জায়গা হোল না।

মাকে আবার মনে পড়লো সেই উনিশের শেষে - যখন দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি প্রায় আসন্ন। বাবা বোধ হয় প্রথমে ঠিকঠাক বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি যে আমার পক্ষে এই 'বিদেশে-পাড়ি' ব্যাপারটা আদৌ ঘটানো সম্ভব! কিন্তু যেদিন বুঝলেন যে আমাকে আর আটকানো সম্ভব নয়, সেদিন কাছে ডেকে বেশ কিছু গম্ভীর কথা বলেছিলেন, যা শুনে আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ এর আগে বাবা কোনদিন আমাকে কোন গম্ভীর কথা বলেননি। বাবা সেদিন কথা শেষ করেছিলেন এই বলে যে "কোনও ভয় নেই, তোমার মায়ের আশীর্বাদ সঙ্গে থাকবে"। দেশ ছাড়ার দিন মনে হয়েছিলো যে বাবার আশীর্বাদটা পেলাম কি পেলাম না তা ঠিক বোঝা গেলো না, কিন্তু বাবা মারফৎ মায়ের আশীর্বাদটা ঠিকই পেলাম! এরপর আবার সেই একই ঘটনা - মাকে আবার ভুলে গেলাম। তখন বিদেশে থিতু হওয়ার সংগ্রাম, পায়ের নিচে জমি খোঁজার সংগ্রাম; তার ওপর মজলাম মেমে! মায়ের কথা ভাবার সময় কোথায়?

মাকে আবার মনে পড়লো যখন শুরু হোল আমার 'সিঙ্গল-ফাদারহুড' – আমার তিন কন্যাকে নিয়ে, যখন ওদের বয়েস মাত্র ১, ৩ আর ৪! কারণ সেই একই - ওদের জুতোর ফিতে বাঁধা, স্নানের সময় ওদের মাথায় জল ঢালা, ওদের জামার বোতাম সেলাই করা, এমনকি ক্রমে ওদের সাথেই নারকোল-নাড়ু আর রসবড়া বানানো! সোয়েটারটা এখনও ওদের জন্য বা ওদের সাথে বুনে উঠতে পারিনি, পারলে গর্বিতই হতাম! তবে হ্যাঁ, মেয়েদের মাফলার বোনা শিখিয়েছি – এই আমার 'মায়ের ছেলে' আমিই! আমার মধ্যম কন্যা মায়ার বানানো মাফলার সযত্নে রাখা আছে আমার কাছে। এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে আমার বছর দুই ডাক্তারি পড়ার অভিজ্ঞতা, যখন শিখেছিলাম সার্জারিতে মানুষের চামড়া সেলাই!

তবে এইসবের কোনটাই আমার কাছে তেমন বিশেষ কিছু নয়। বিশেষ যা, তা হোল আমার মাকে আমার চিনতে পারা। যা আমি পেরেছি বিগত ১৫ বছরে, আমার তিন কন্যাকে 'সিঙ্গল-ফাদার' হিসাবে বড় করতে গিয়ে। ফেলে আসা স্মৃতি বা টুকরো ঘটনা মনে পড়ায় প্রায়ই মনে হয়েছে যে কি অসাধারণ ছিলেন এই মহিলা! সহায়-সম্বলহীন (দেশ বিভাগের পর মায়ের বাপের বাড়ি হয়েছিলো বিহারের গয়ায়, যা তখনকার দিনে কোলকাতার তুলনায় ছিল বিদেশ), আত্মীয়-পরিজনহীন (মায়ের একমাত্র ভরসা ছিল আমার বাবা, যিনি কর্মসূত্রে প্রায়ই থাকতেন অন্যত্র, আর আমরা তিন ভাই ছিলাম খুবই ছোট), প্রায়ই কপর্দক-শূন্য অবস্থায় এক ভীষণ প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের তিন ভাইয়ের মুখ চেয়ে মায়ের বেঁচে থাকার সংগ্রাম বিগত ১৫ বছরে অনেক রসদ জুগিয়েছে আমাকে – অনেকটা প্রায় একই রকম অবস্থায় আমার তিন মেয়েকে বড় করার সংগ্রামে। প্রায়ই আমার মনে হয়েছে (বিশেষত বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখের দিনগুলোয়, যখন কোনটা আগে সামলাবো সে ব্যাপারে হালে পানি পেতাম না) যে আমার মা পেরেছিলেন, আমাকেও পারতে হবে, পারতেই হবে!

আমার মেয়েরা বড় হয়ে গেলো, আমার এই সংগ্রাম প্রায় শেষ। মায়ের ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া ছাড়া মাকে আর কিছু দেওয়ার সুযোগ হয়নি কোন দিন। তবে প্রতিকূল পরিবেশে আমার সিঙ্গিল-ফাদারহুডের সংগ্রাম হয়ে থাকলো আমার মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। ■

প্রবাসী গৃহবধূ

- আগমনী পাঠক

আমি অনু, অনুমিতা। আজ ভাবলাম আপনাদের কাছে আমার জীবনের টক মিষ্টি তেতো নানান স্বাদের কথা ভাগ করে নিই। আমি একজন প্রবাসী গৃহবধূ। হ্যাঁ, প্রবাসে থাকা আমার গৃহবধূ কাজের জন্যই। কি বললেন? এটা কোনো কাজ নয়? এটা আপনাদের চোখে তথাকথিত কাজের লিস্টে না থাকলেও এই কাজেই আমি ২৪x৭ ঘন্টা ব্যাস্ত থাকি। আমি আমার জীবনের গল্প শোনাচ্ছি বলে আবার ভাবতে বসবেন না যেন যে আমি আমার জীবনের কোনো কষ্ট শোনাতে বসেছি, আমি শুধু আমার রোজ নামচাই একটু বর্ণনা করতে চাই। আমার স্বামী এখানে এক নামি সফটওয়্যার কোম্পানির আই টি ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের প্রেমের বিয়ে, প্রেম পর্ব মিটে যাওয়ার পর দুই বাড়ির মতে খুব ধুমধাম করে বিয়ে আমাদের। আমাদের বিয়ের পরে পরেই ওনার পদোন্নতি, আর বিদেশে বদলির সুখবরটি পেয়েছিলাম। তারপর আর কি আমার রোজকার জীবনযাত্রা ছেড়ে ডিপেন্ডেন্ট ভিসাতে চলে এলাম এখানে সুখী গৃহকোণ বাঁধবো বলে। বিয়ের পর বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের ছেড়ে শুধু মাত্র বরের সঙ্গে থাকাটা, প্রথম কয়েক মাস লেগেছিলো এক দীর্ঘ মধু চন্দ্রিমার মতো। প্রথম প্রথম বললাম তার কারণ সময় কখনো থেমে থাকে না, সবকিছুরই শেষ হয়, তাই এটাও শেষ হলো। সকাল সকাল উঠে ব্রেকফাস্ট রেডি করা তারপর দুপুরের খাবার তৈরি করে প্যাক করে দিই, আর আমারটা ঢাকা দিয়ে রাখি।" উনি তবে প্রতিদিন আলিঙ্গন না করে যান না আমাকে,,"--- ঠিকই ধরেছেন কথা গুলো বলার সময় সত্যিই একটু রক্তিম হলাম লজ্জায়। এরপরই শুরু হয় আমার অখণ্ড অবসর। এখানে প্রথম আসার পর একা একাই বেড়িয়ে পড়তাম নতুন দেশ দেখতে, তখন সব কিছুই খুবই নতুন, কখন যে সময়ের কাঁটা ঘুরে যেত বুঝতেই পারতাম না। তারপর ফিরে এসে সোশ্যাল মিডিয়াতে কাটিয়ে দিতাম সমস্ত প্রাণবন্ত সময়টুকু। কিন্তু নতুন পুরানো হতে তো শুধু সময়ের অপেক্ষা। এরপর অখণ্ড অবসরের সময়গুলো ও আমাকে জিজ্ঞাসা করতো কখন যাবে ! তখন শুরু হলো আর এক নতুন জীবন, প্রতিদিনই সময় কাটানোর ফন্দি ফিকির খুঁজতে শুরু করি, কখনো অলসতার পথ বেছে নিই, বা কখনো কোনো সৃজনাত্মক কাজ। অলসতার মধ্যে বেছেছিলাম মুভি দেখা, ইউ টিউব এ নানান রকম ভিডিও দেখা আর বই বিশেষ সাথে নেই, কিছু আমার সাবজেক্ট এর বই আছে ভালো লাগলে নেড়েচেড়ে দেখি। অতিরিক্ত ব্যাস্ততা যেমন আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ভেঙ্গে দেয় তেমনি অতিরিক্ত অবসর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে দেয়, আমার ও তাই হলো। যে সমস্ত পরীক্ষার প্রস্তুতি একসময়ের ব্যাস্ততার কারণে নিয়ে উঠতে পারিনি, আজ এই অফুরন্ত সময়েও সেই প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্যম আসেনা আর।

অতিরিক্ত অবসর ব্রেন বুদ্ধিকেও অবসরে পাঠিয়ে দিয়েছে। কাজ না করলে কি আর ছুটির মজা আসে? কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মরতে দিইনি। তাই নতুন নতুন কাজের সন্ধান চলতেই থাকে।

প্রবাসে থাকা ব্যাপারটা ফ্যান্টাসি তখন পর্যন্তই থাকে যতক্ষণ না প্রবাসে বসবাস শুরু হচ্ছে। প্রবাসী গৃহবধূদের জগৎ ওই একজন লোককে ঘিরেই থাকে, তার হাঁসি কান্না সব কিছুই ওই একজন কে ঘিরে আবর্তিত হতে শুরু করে, তার অন্যতম কারণ আপন মানুষ জনের অভাব। এখানে সবথেকে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটা আসে, যাকে ঘিরে আমাদের জগৎ আবর্তিত হয় তার জগতের সব কিছু কিন্তু আমরা নয়। সেকারণেই তাদের ব্যবহারের ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক বড় আকারে দেখা যায় আমাদের জীবনে। শিকড় ছেঁড়া গাছের মতো অবস্থা আমাদের, জঙ্গল থেকে উঠিয়ে ইট কাঠ পাথরের মাঝে সাজানো বাগানে থাকা পাখিটির মতো বলতে পারেন, যাদের পুরানো কথা মনে করে মন খারাপের অধিকার থাকলেও ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। পুরানো সব বন্ধুবান্ধবরাও আর মন খারাপের কথা শুনতে চায় না তাই আমি সীমা স্বর্গের ইন্দ্রানী হয়েই খুশি।

যাকগে ওই সময় কাটানোর সব থেকে অসাধারণ উপায় রন্ধন। নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করলাম তখন। পাশের জন ও ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো, তারই পরামর্শে শুরু হলো আমার নিজের ইউ টিউব চ্যানেল। এই কাজে সত্যিই নতুন আমাকে খুঁজে পেলাম। আমাদের দেশে ইংলিশ শেখা আর বলা দুইই খুব আভিজাত্যের ব্যাপার, কিন্তু যে দেশে আমি আছি ওখানে কিন্তু ইংলিশে সকলে এত পটু নয়, এদের সমস্ত কাজ এরা এদের মাতৃভাষাতেই করতে পারে। কি ভালো না ব্যাপার টা বলুন ! তবে এদের ইংলিশের অপটুতা আমাকে আমার নতুন কাজ দিলো। স্পাউস ভিসা তে পার্ট টাইম জব এর অনুমতি আছে দেখে নিয়েই নিলাম ইংলিশ টিচিং এর পার্ট টাইম জব। এবার সত্যিকারের নতুন এক গতি পেলো আমার জীবন। তবে আজ সকাল এ আরো একটা সুখবর পেলাম, কয়েকদিন আগে করা প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এর এপ্লিকেশন এর পসিটিভ রিপ্লাই পেলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই যোগদান করতে পারবো। তাই গৃহবধূর কাজের সাথে এই নতুন ফুল টাইম কাজের পারমিশন নেওয়ার প্রসিজার দেখতে বসে ভাবলাম আপনাদের ও জানাই একটু।

এবার আসি, আবার পরে কথা হবে আপনাদের সাথে, ভালো থাকবেন। ■

যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে

- দুহিতা সেনগুপ্ত

"আলস্যের সাথে লড়াইয়ে যদি জয়ী হতে পারো মা, এ জীবন তোমার" - এই শব্দগুলো কে চূড়ান্ত অবহেলায় মাড়িয়ে-যাওয়া দিন যাপনের পরেও প্রতি ১৫ই মে, প্রতি ৬ই সেপ্টেম্বর নতুন করে ঘুম ভাঙ্গে। মন পিছলে যায় একদিন থেকে আরেকদিনের গল্পে। মনে পড়ে তখন আমি ক্লাস থ্রী-তে, প্রতিদিন বিকাল ৩:৩০ থেকে ৫টা অবধি দাদুর পাঠশালায় পাঠ চলত। সে পড়ায় কোনো syllabus-এ tick পরত না। কোনো weekly, yearly, monthly চোখরাঙানিদের আস্কারা দেওয়া হতনা। প্রতিদিনই শুরু হত যেকোনো বইয়ের প্রথম পাতার অনিবার্য ওই stanza দিয়ে, "The Constitution of India", একবার বাংলায়, একবার ইংলিশ-এ। তারপর প্রতি শব্দের মানে ও তা প্রতিনিয়ত মনে রাখার অঙ্গীকার। তখন, বারবারই বলেছি, "দাদু, তুমি জাননা, এটা স্কুলে পড়ায় না, পরীক্ষায় আসেনা", শুধু হাসতো। তারপর ছিল দুই থেকে কুড়ি অবধি নামতা মুখস্থ বলার পালা। তখন মন, মুগ্ধতা, বিস্ময়, অনুভূতি-- সবকিছুরই বয়স এত কম, যে একটা ৭৮ বছর বয়েসী আওয়াজে ঝড়ের গতিতে ১৯ এর নামতা শুনে অবাক লাগত না। ভাবতাম এ এমন কি বড় ব্যাপার, গুনটা তালে শিখলাম কি করতে। এখন বুঝি, মাথা যে ক্যালকুলেশন এ অভ্যাস গড়ে, তাকে digitize করে কার সাধ্য ! একদিন মনে আছে, ৩:৩০ র বদলে ৩:৪০ এ ঢুকেছিলাম, বই নিয়ে আসতেই দাদু বলল, তোমার আর লেখাপড়া হবেনা। কেন জানি মনে হত দাদু একটা ঘড়ি আর ঠাম্মা তার কাঁটা। দাদু breakfast করছে মানে সকাল ৯টা, তেল মাখতে উঠছে মানে ঠিক ১০:৩০টা, বিকেলে চা এর জন্য লক্ষী ডাকটা আমাদের কাছে ৪টে বাজার ঘন্টা। মাসের আরো একটা দিন এর অপেক্ষায় আমি আর হিয়া বসে থাকতাম, সেদিন ছিল দাদুর পেনশন পাওয়ার দিন, আমরা স্কুল থেকে ফিরতাম ১১টা নাগাদ, তারপর রিকশা করে, দাদু মাঝে, আমি একধারে, আরেকধারে হিয়া। পেছনে থাকত আশীষ কাকু সাইকেল নিয়ে। পুরুলিয়ায় এ রিকশা বেশ আরামের, বড় আর নীচু। যারা নিজেকে এবং যাদেরকে সবাই, রোগা বলে মনে করে, সেরকম তিনজনের একটা রিক্সায়, পনের কুড়ি মিনিটের এর যাত্রা বিশেষ বিড়ম্বনা নয়। কিন্তু আমাদের সাথে আরেকজন ও যেত, সে ছিল দাদুর লাঠি, সে আর ওই রিক্সায় জায়গা করে উঠতে পারতনা, তাকে আড়া আড়ি ভাবে ধরতে গেলে প্রত্যেক গাড়ির সাথে একবার করে ধাক্কা খায়, আর লম্বা করে ধরলে বারবার রাস্তায় পড়ে যায়, ওটা রিক্সাওলার একটা extra দায়িত্ব ছিল, প্রতি দুবার প্যাডেল অন্তর লাঠিটাকে পিছন থেকে কুড়িয়ে আনা... যে রাস্তা দিয়ে যেতাম, তার মোটামুটি লোকজন দোকানদার থেকে শুরু করে সকলেই দাদুর "জয় মা" রবে কেঁপে উঠে ওই মহাযাত্রায় সামিল হত... আমাদের মজা ছিল অন্য জায়গায়, ফেরার পথে সারামাসের বায়নার লিস্ট এ টিক মেরে দীর্ঘদিন এর ইচ্ছাপূরণ, গলিতে ঢুকতে না ঢুকতে সক্কলে জেনে যেতো, আজ দাদু পেনশন পেয়েছে, আর ঠাম্মাকে কেউ কখনো চোখে না দেখলেও এটুকু প্রত্যেকেই জানত যে দাদুর বউ এর নাম লক্ষী। এর পরের দৃশ্যে লক্ষীরানী সেনগুপ্ত দরজার মুখে দাঁড়িয়ে, দাদু প্রথমেই মিষ্টির হাঁড়িটা তার হাতে দিত। আমরা একপ্রকার যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকতাম।

আসলে সময় থাকলে, বা অসময় না থাকলে মাথা ফাঁকা থাকলে, বা অপ্রিয় ভাবনায় ভর্তি থাকলে, সব ক্ষেত্রেই বোরোলীন হয়ে ওঠে এই দিন গুলো। আজ ও হলো, ভাবলাম কালো হরফ চড়াই এদের ওপর। ■

দেশ

- শঙ্কর বসু

দেশ নামের চুম্বকের মেরুকরণ আমার হাতে ছিলনা
যারা হাত দিলেন তাদের সচেতন বলতে বাধে
ফুলচন্দনের আবডালে ঢাকা পড়ে দেশ আমার
ক্রমশ অবস্থান স্পষ্ট করে গ্রাম-শহর-সড়ক
আকাশের নীল, রক্তের লাল আর সব রঙ হল
বিভাজনের তীক্ষ্ণ ছুরি
ফালাফালা ছবি মার্ক্স, গান্ধী, রবীন্দ্র, নজরুল;
আমার দেশপ্রেমের আগুন নিয়ে ছুটল
তন্দ্রাহীন অলৌকিক চন্দ্রযান
অন্তরীক্ষে চর্কিপাকে চাঁদের বুকে ঝড় নামিয়ে থামে সে।

এই সময়ের কথা কি ভেবেছিলে সুভাষ?
তোমার রক্ত কি ধুলোয় মিশেছিল
এই স্বপ্নের বিহ্বলতায়?
আরো যারা হেঁটেছিল শৃঙ্খলপায়ে
দ্বীপান্তরে...
তাদের স্বপ্নেও কি সবুজ সাদা আর গেরুয়া রঙ
এমনি তীক্ষ্ণধার ছিল?
বড় কঠিন এই দেশ প্রেম এর খেলা
বড় অবান্তর।

তার চেয়ে এসো আমরা কথা সাজিয়ে যাই
ভাল থাকার কথা, ভাল কিছু ভাবনার কথা
কথার নির্মোকে চাপা পড়ে যাক শতাব্দীর ইতিহাস
শিক্ষার আলো, চেতনার বাতাস
তথ্যের চাদরে মুড়ে ফেলি যুক্তির উষ্ণতা
আর কোন ভয় নেই, সব শান্তি, ওম শান্তি...
শুধু সিঙ্গুর-নন্দিগ্রাম আজও অপেক্ষায়
শিল্পের ওম মেখে রাতের অন্ধকারে।

শহর টোকিও, শীতকাল

- শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

পাঁচতলার কাঁচের জান্‌লা দিয়ে
যতদূর দেখা যায়
শুধুই বসতি, দিগন্ত নিঁখোঁজ।
ব্যস্ত জনপদ, মানুষের সদর্প গৌরব।

সারি সারি বাড়ী; হলুদ সবুজ কালো
নীল সব ছাদ, আর লোহার রেলিং।
রাস্তায় গাড়ীর সারি, আর বিজলীবাতির স্তম্ভ,
ব্যবসায়ী মানুষের অবিরাম আনাগোনা।

গাছ কই? আর পাখি?
পাখি বলতে শুধুই সরব কাক?
লোভের তাগিদে নির্বিচার সর্বভূক।
সভ্যতার অজস্র সম্ভার সাজিয়ে
শহর টোকিও ঘোষণা করছে
আধুনিক, ধনিক জাপানের জয় জয়কার।

বৌদ্ধ, শিন্তো মন্দির? পুরাতন, চিরন্তন সম্পদ?
তারাও আছে এখানে-সেখানে – প্রায় লুকিয়ে,
যেন মুখচোরা, পিছিয়ে-পড়া, বয়স্ক সহযাত্রীর মত।
স্নেহ পায় সভ্যতার, হয়তো বা শ্রদ্ধাও।
বিশেষত বৎসরান্তের এই ছুটির মরসূমে।

আবার তাকাই বাইরে, প্রকৃতির, সবুজের, প্রত্যাশায়।
আত্ম-সমর্পিত গাছগুলো শীতে পত্রহীন, যেন মৃত।
ঘাসেরাও বরফের নীচে, যেন মরে বেঁচেছে।
কি হবে হংস-মধ্যে-বকের মত বিসদৃশ হয়ে!

হঠাৎ চোখ পড়ে নড়ে-ওঠা মরা গাছের ডালে।
অবাক কান্ড – একটা ছোট পাখি – নীল আর সবুজে মেশানো।
দুটো ডাল যেখানে মিশেছে সেখানে ছোট্ট গর্ত্তে
জড়ো করছে মুখে করে বয়ে-আনা খড়কুটো
বাঁধছে বাসা সযত্ন নৈপুণ্যে, নিঃশব্দে একটু একটু করে।
তার মনে কি বসন্তের স্বপ্ন? আর অজানা প্রেয়সীর?
সে কি গ্রাহ্য করে না মানুষের এত কীর্তি, এত দম্ভকে?
যেমন করেন নি বুদ্ধ, যেমন করে না প্রকৃতি।

সাম্যবাদ ও স্বপ্ন দেখা

- সুব্রত বনিক

বিদ্রোহী কবি নজরুল তুমি
সাম্যবাদের কবি
রঙ, তুলির বদলে লেখনি হাতে
এঁকেছিলে এ সাম্যের ছবি।
তোমার চোখের তারায় তারায়
মোর এ স্বপ্ন দেখা,
'তোমার স্বপ্ন' মোরে দেয় প্রেরণা-
তাই নবরূপে বাঁচতে শেখা।
বাঁচবো হয়ত আমি আরো
কয়েকটি বছর ধরে,
'রঙিন' গাছের ফুলগুলি যেন
অকালে না যায় ঝরে।
চোখের সামনে গড়ে উঠুক
সুন্দর পবিত্র এ পৃথিবী,
যেন দেখে তারে মনে হয়
কবিতায় আঁকা এক ছবি।
আমার সেই পৃথিবীতে না যেন
কেউ মরে অনাহারে,
কেউ যেন না জানায় তারি
ক্ষুধা, 'ক্ষুধার কাতর স্বরে'।
অশিক্ষার আঁধার যেন যায় কেটে,
আসে 'শিক্ষার নব প্রভাত',
চিকিৎসাহীনতায় না যেন মরে কেউ
সংসার না হয় হাভাত।
সকলে যেন বাঁচে এ সংসারে
মাথা উঁচু করে,
বাঁচতে যেন না হয় কাহারেও
কাহারো দয়ার তরে।
বন্ধ হোক সেই সুন্দর পৃথিবীতে
যত ধর্ষণ, খুন ও হানাহানি,
চেতনার উন্মেষে সে সব একদিন
হবেই নিশ্চয় তা জানি।

দেশ

- শান্তনু চক্রবর্তী

বোকাবাক্সে চেঁচামেচি, পথের মোড়ে গলাবাজি !
চায়ের কাপে উঠছে তুফান, সেনাই শুধু কাজের কাজী |
দেশ বাঁচাতে কোমর বেঁধে, ফেসবুকেতে বমি করা,
টুইটারই বা ব্রাত্য কেন, স্বল্প কথায় গালটি পারা !

গলা এবং নোট এর জোরে, জনাদেশ আজ যায় যে কেনা|
"সহিষ্ণুতা দেশবিরোধী", এমন কথাও বড়ই চেনা !
অপর দেশের সর্বনাশে, নিজ দেশের পোয়া বারো,
মেনে নিতে কষ্ট হলে, মানে মানে কেটে পড়ো !

দেশের সংজ্ঞা বুঝতে হলে, নিজের শিক্ষা ভুলতে হবে !
আদিকাব্যের বিশ্লেষণে, দেশের কথা জুড়তে হবে !
পছন্দসই নির্যাসে যে দেশের মানে যাবে বোঝা,
জবরদস্তি কেন আবার সর্বধর্ম শান্তি খোঁজা!

অর্থনীতি, বিদেশনীতি, গালভরা সব নীতি'র কাহন,
সবার উপর ধর্মনীতি, বাকি সবাই তারই বাহন
বিরোধিতা, দেশদ্রোহে নেই যে তেমন কোন ফারাক
জেলে যাওয়ার হলে মতি, বিরোধীদের লাইনে দাঁড়াক !

রামরাজ্য গড়ার পথে, প্রয়োজন যে বানরসেনা,
গো-ভক্তের ভক্তিস্রোতে, সংখ্যাধিক্য ভীষণ চেনা !
সংখ্যালঘু সমুদায়ের, বাক্যি যেন থাকে মাপা,
বুকনিপ্রবণ হলেই, সংখ্যাগুরু'র ভারে পরবে চাপা !

অতএব ভাবছি বসে, দেশ কি? আমি আদৌ জানি?
প্রথাগত পুঁথি পড়া, অতীতের সব কেরেস্তানি !
দেশভক্তি'র প্রচার সভায়, আমার কোন নেই প্রয়োজন,
দেশটি আমার থাকুক বুকে, রন্ধ্রে বহুক তারই রণন !

দুঃস্বপ্ন

- কৌশিক ভট্টাচার্য্য

মৃত সন্তানের দেহের টুকরো কুড়িয়ে
শেষকৃত্য করে আসে যে পিতা
তার সন্তানের রক্ত
রক্তবীজ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মধ্যরাতে।
বীজমন্ত্রে
হাজার হাজার পিতা
সেই রাতে
স্বপ্ন দেখে মৃত্যুর।
জানু পেতে
করজোড়ে বসে
তারা প্রার্থনা করে
হে করুণাময় পরমপিতা
ক্ষমাঘেন্না করে
যেন আমাকে আগে ধ্বংস করে দিও দাঙ্গায়।

Dr. Sankar Bose, BATJ member and former resident of Japan, Professor of Geology at Presidency University, Kolkata receiving Shiksha Ratna award on Teacher's day 2019 from Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee.

ফিরে দেখা

- বিশ্বনাথ পাল

ভূমধ্যসাগর তীরে নিথর নিষ্পাপ শিশুটি
মনে পড়ে?
তার লাল টুকটুকে জামা
নিশব্দে ধিক্কার জানায় পৃথিবীকে
সভ্যতা..... তোমার দুহাত আজও রক্তে রাঙা

অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি আমরা
প্রস্তর যুগ... মধ্য যুগ পেরিয়ে
আজ এই আধুনিক আন্তরজাল এর দুনিয়ায়
প্রযুক্তি আজ হাতের মুঠোয়
তবু স্থবির মন কেন এক পাও এগোয়না?
বোতামের হালকা চাপে সবকিছুই দোরগোড়ায়
তবু ভুখা মানুষের মিছিল কেন ফুরয়না?

গগনচুম্বী অট্টালিকায় সেজে ওঠে পৃথিবী
বিলাস বৈভবের অফুরন্ত আয়োজন
তবু এক টুকরো আস্তানার খোঁজে সাগরে ঝাঁপ দেওয়া
শঙ্কিত ভীতিবিহ্বল অগনিত মানুষের ছবি
একটুও কি নাড়া দেয় না?
শীতল ঘরে বসে থাকা শীতল কঠিন মনটাকে

চাঁদ ছাড়িয়ে আজ আমরা মঙ্গল এর পথে
লাল গ্রহে ঘর বাধার স্বপ্ন
হায়....লাল আমাদের বড় প্রিয় রঙ
তাই এই সবুজ পৃথিবী কেমন রক্তিম করে তুলেছি
অসহায় মানুষের অবিরত রক্তক্ষরণে

ফিরে দেখা বড়ই প্রয়োজন
মুখোশের আড়াল আর নয়
কোথায় সভ্যতার সঠিক প্রতিচ্ছবি?
লাল গ্রহে উড়ে চলা মহাকাশযান
না ওই লাল টুকটুকে জামায় মৃত শিশু।